কেন এই লেখা

ইচ্ছেটা নানা কারণে বহু বছর ধরে আমার মধ্যে তৈরি হয়েছিল এবং ঘুমিয়ে ছিল। সত্তরের দশকের রাজনীতি বাংলা সাহিত্যের জগতে অনেকটাই জায়গা করে নিয়েছে। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, চলচিত্র সবজায়গাতেই এই রাজনীতি একটা সময়কাল জুড়ে বিরাজ করেছে। অনেকের সঙ্গে আমিও পড়েছি সেগুলো। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, অতৃপ্তি থেকে গেছে। যাঁরা আমাদের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, তাঁদের লেখায় আমাদের চিন্তা-ভাবনার গতিপ্রকৃতি, আবেগ-অনুভূতি, সমস্যা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এগুলো ঠিকঠাক প্রতিফলিত হচ্ছিল না। যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা কলম না ধরলে এ অভাব পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের সংগঠন গোপন থাকার কারণে এক এলাকার কর্মীদের পক্ষে অন্য এলাকার বিষয়ে সবকিছু জানা অসম্ভব ছিল। ফলত যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের লেখায় টুকরো বা আংশিক ছবি উঠে এলেও আমাদের বৈচিত্র্য এবং পার্থক্যগুলো সার্বিকভাবে বা সমগ্রতায় ফুটিয়ে তোলা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। আমাদের রাজনীতি সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতাও 'অন্ধের হস্তিদর্শনের' মতো, কারণ, সাংগঠনিকভাবে সার্বিক সারসংকলন বা মূল্যায়ন কখনও হয়নি। আমাদের উত্তরণও ঘটেছে খণ্ড খণ্ড ভাবে এবং বিভিন্ন সময়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন এবং নানা স্তরে বিন্যস্ত। তবুও আমার মনে হয়েছিল, আমরা নিজেরা নিজেদের কথা

লিখলে তা অনেকটাই প্রকৃত চিত্রায়ণ হবে এবং একসময় সেগুলোর ভিত্তিতে হয়তো বা একটা সার্বিক চিত্র ও মূল্যায়ন তৈরি হতে পারবে। এভাবেই আমার নিজের লেখার ইচ্ছেটা তৈরি হয়েছিল।

এবং জলার্ক পত্রিকা আমার সেই ঘুম ভাঙায়। কোনো সূত্রে আমার অতীত জানতে পেরে ওই পত্রিকার স্বপন দাসাধিকারি তাঁদের 'জেল বিদ্রোহ' সংখ্যায় আমাকে বর্ধমান জেলের ঘটনা নিয়ে লিখতে বলেন। সেই লেখা পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হবার পর স্বপনবাবুর অনুরোধে আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা শুরু করি। ১৯৬৭ সালে আকস্মিকভাবে সত্তর দশকের রাজনীতির সঙ্গে আমার যোগসূত্র তৈরি হয় এবং পরবর্তীকালে 'চারু মজুমদারের রাজনীতি' নামে পরিচিত রাজনীতির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৭৩সালে। আমি স্বপনবাবুকে আমার এই পর্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখার ব্যাপারে সম্মতি জানাই। *এবং জলার্ক*পত্রিকার পরবর্তী দশটা সংখ্যায় সেগুলো প্রকাশিত হয়। লেখাগুলো প্রকাশিত হবার পর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও আরও যাঁরা লেখাগুলো পড়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে অনুরোধ আসতে শুরু করে, লেখাগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাকারে পরিবেশন করার। বেশ কিছু সময় চলে যাবার পর সেই কাজে হাত দেবার সুযোগ তৈরি করে নিলাম।

জীবনের এই পর্বের অভিজ্ঞতা যখন টুকরো টুকরো করে গল্প বলার মতো করে কাউকে কাউকে শুনিয়েছি, তখন দেখেছি, তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন এবং উপভোগ করতে করতে অন্তর্নিহিত বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হয়, শুকনো তাত্ত্বিক আলোচনা কিছু মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও সবার কাছে নয়। তাই ভেবে রেখেছিলাম গল্প বলার ঢঙেই লিখব, একটার পর একটা ঘটনার ছবি সাজিয়ে দেব। পাঠক নিজের নিজের মতো করে বিশ্লেষণ করে নেবেন। আমি কোনো উপন্যাস লিখতে বসিনি, কারণ, সেখানে কল্পনার রং মেশাতে হয়। যা লিখব, তার সবটাই বাস্তব, আমার জ্ঞানমতে নির্ভেজাল তথ্য, পরিবেশনাটা শুধু হবে গল্প বলার ঢঙে। এতদিন পরে যখন প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগের ঘটনাবলি উপস্থাপনার উদ্যোগ নিয়েছি তখন লেখার মধ্যে আজকের চেতনার মিশ্রণ এড়ানো যাবে না। চেষ্টা করব যাতে সেদিনকার বোধ ও আজকের বোধের মধ্যে একটা ফারাক রাখা যায়। জানি না কতটা পারা যাবে।

লেখার ভালোমন্দ, ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার দায় সম্পূর্ণত আমার। এজন্য পাঠকের কাছে আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

১৯৬৭ সালের শেষার্ধ। সন্ধে হব হব। নারকেলডাঙা হাইস্কুলের সামনে মিষ্টির দোকানের রোয়াকে বসে আছি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। সকলেই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। স্মল টুলস কারখানার শ্রমিক, আমাদের বন্ধু সত্য, কারখানা ফেরত আমাদের ঠেকে এসে হাজির। আমাদের মুখচোখ দেখে প্রশ্ন করল, সব প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন? আমাদের মধ্যে একজন কেউ বলে উঠল 'সকালে ভুটান এসে থ্রেট করে গেছে, ফুলবাগান মোড়ের ওদিকে আমাদের কেউ গেলেই হাত পা কেটে নেবে'।

সত্য কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'শোন অত চিন্তার কিছু নেই। বাজারে এখন নতুন পার্টি এসেছে। টপ হিরো পার্টি। ওদের দলে নাম লেখালে ওরাই প্রোটেকশন দেবে। শুধু বলবি, দাদা, আপনাদের পার্টি করি বলেই আমাদের ওপর রাগ'। প্রায় সমস্বরেই আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ওই পার্টি করলে কী কী করতে হবে? সত্য বলল, 'তেমন কিছু নয়, শুধু সপ্তাহে একদিন করে ক্লাস করতে হবে। আমিও ওই পার্টি করি, আমাদের কারখানার অনেকেই করে'।

সব বন্ধুবান্ধবরা এলে সেদিনই জরুরি আলোচনা করে ঠিক হল, পরের দিনই যাব ওই পার্টিতে নাম লেখাতে। সত্যর কাছে জেনে নিলাম কোথায়, কখন, কার কাছে যেতে হবে। পরের দিন রবিবার ছিল। সকালবেলাতেই দশটা নাগাদ প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মতো বন্ধুদের দল নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম খোকনদার বৈঠকখানায়, বললাম, আমরা আপনাদের দল করতে চাই। তখন বোধহয় ক্লাস চলছিল। খোকনদা কী যেন আলোচনা করছিলেন বেশ কয়েকজনকে নিয়ে। ঘাড় নেড়ে হাতের ইশারায় আমাদের বসতে বললেন। ব্যস, হয়ে গেল আমাদের দলভুক্তি। খোকনদার বৈঠকখানায় আমাদের যাতায়াত শুরু হল। এভাবেই কোনো পারিবারিক-রাজনৈতিক শিক্ষা বা সামাজিক-রাজনৈতিক শিক্ষা ছাড়াই ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়লাম এক রাজনৈতিক ধারার সঙ্গে। আমি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র।

ষাটের দশকের শেষার্ধে কলকাতার বুকে একটা সামাজিক ঝোঁক গড়ে

উঠেছিল। যেটাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তি বীরত্বের ঝোঁক। এলাকায় এলাকায়, পাড়ায় পাড়ায়, একই পাড়ার মধ্যে বিভিন্ন বয়সি কিশোর, তরুণ যুবকদের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মস্তান গজিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এর আগে কিছু মস্তান দেখা যেত বা তাদের কথা শোনা যেত বটে, কিন্তু তারা ছিল সংখ্যায় হাতে গোনা, অনেক উঁচু দরের। যাদের সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি যাই বলুন না কেন, ছিল কমবেশি অনেকটাই বিস্তৃত। আমরা তখন কয়েকটা নাম জানতাম। নারকেলডাঙায় শোভা-ঘোঁতন দুই ভাই এবং বেলেঘাটায় সন্তু-বলরাম দুই ভাই, বেলঘড়িয়ার ইনু মিত্র, কলকাতার গোপাল পাঁঠা, চন্দননগরের রাম চ্যাটার্জী ইত্যাদি। এদের কারও কারও আবার রাজনৈতিক যোগাযোগ বা চরিত্র ছিল। কিন্তু আমি সে সময়ে যাদের কথা বলছি, এক একটা পাড়ায় ডজনে ডজনে তাদের দেখা মিলত। তাদের সঙ্গে রাজনীতির যেমন কোনো যোগ ছিল না, তেমনই আর্থিক (এখনকার ঠিকাদারি, প্রোমোটারি বা তোলাবাজির মতো) কোনো প্রেরণাও ছিল না। নিছকই ব্যক্তি বীরত্ব। তুচ্ছ কোনো কারণে বা অকারণেই, এমনকি নিছক নিজেদের ওজন বোঝাতে বা যাচাই করতে মাঝেমধ্যেই এরা ঝগড়া মারামারিতে জড়িয়ে পড়ত। এবং তখন মুড়ি-মুড়কির মতো বোমা পড়ত। বোমা বা পেটো তখন কলকাতায় কুটির শিল্প।

দুটো ঘটনা উল্লেখ করলে কিছুটা বোঝা যাবে। পারিপার্শ্বিক প্রভাবে আমার যখন বোমা তৈরি শেখার শখ চাগিয়ে উঠল, আমাকে সেটা শেখাল আমার ছোটো ভাইয়ের সহপাঠী ক্লাস সিক্সের ছাত্র কেলো। রাজনৈতিক সংযোগের আগের ঘটনা। গরমের ছুটির এক দুপুরে আমাকে নিয়ে কেলো সরকার বাজারের এক মুদিখানা দোকান থেকে বোমার মশলা (চালু কথায় লাল-সাদা) কিনে আনল। পরের দিন দুপুরে বাড়ির শিল-নোড়ায় সেগুলো গুঁড়ো করে রাখা হল। তার পরের দিন ওই দুপুরেই (মায়ের ঘুমোনোর সুযোগ নিয়ে) এক পরিত্যক্ত পুকুরসহ বাগানে কেলোর কাছে আমার বোমা বানানোর হাতেখড়ি হল। সাড়ে চারখানা (একটা ছোটো, টেস্ট করার জন্য) বোমা বানানো হয়েছিল। একটা বড়ো টিনের কৌটোতে করে নিয়ে এক পোড়াবাড়ির খাটা পায়খানার নীচে সেগুলো লুকিয়ে রাখা হল। আসার পথে পাড়ার জমিদারবাড়ি, অমল চৌধুরীর বাড়ির নেপালি দারোয়ানের টুলের পাশে টেস্ট করা হয়েছিল ছোটো বোমাটা। বেচারা দারোয়ান আচমকা বিকট আওয়াজে চমকে উঠে টুল থেকে পড়ে যেতেই আমরা দে-দৌড়।

আর একটা ঘটনা হল কেলোর এক বন্ধু ছিল রাম, যাকে মঙ্গোলিয়ান মুখাকৃতির কারণে স্কুলে সবাই রামবাহাদুর বলে ডাকত। সে ছিল পেশাদার বোমা বিক্রেতা। নিজের বাড়ির খাটা পায়খানায় বসে, নীচে লুকিয়ে রাখা সরঞ্জাম নিয়ে বোমা বানাত এবং তারপর সেগুলো বিক্রি করত। অনেকেই বোমার জন্য রামের খদ্দের ছিল। রামবাহাদুরের লাভের বহর বোঝা যাবে একটা হিসেবের উল্লেখ করলে—আমি আর কেলো এক টাকায় সাড়ে চারখানা বোমা বানিয়েছিলাম, যার চারখানা ছিল এক ভরি করে মশলা দিয়ে। রাম এক ভরির একটা বোমা বেচত এক টাকা করে।

সমাজ মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা এই বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন। সমসময়ে তপন সিংহ পরিচালিত 'আপনজন' সিনেমার রবি এবং ছেনো এই ধরনের মস্তানদের প্রতিনিধি, আমি যাদের কথা বলতে চাইছি।

এইরকম এক সামাজিক পরিবেশে আমার বন্ধুদের মধ্যেও বেশ কিছু কুচো মস্তান তৈরি হয়েছিল। আমরাও আশপাশের পাড়ার দলবলের সঙ্গে হাতাহাতি, মারামারি, কখনওসখনও বোমাবাজি ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়তাম। নারকেলডাঙা হাইস্কুল কেন্দ্রিক পাড়া হওয়াতে আমাদের বন্ধুদের দলটা বেশ বড়ো ছিল। আড্ডার চেহারাটা ছোটোখাটো জমায়েতের চেহারা নিত। কিছু কুচো মস্তান এবং সংখ্যার বলে বলীয়ান হয়ে অনেক সময় আগ বাড়িয়ে আমরাই গণ্ডগোল শুরু করতাম। তবুও যে সমস্ত মস্তানরা ছুরি চালাত বা খুনজখমের মামলায় পুলিশহাজত বা জেলহাজত ঘুরে এসেছে, তাদের আমরা বেশ সমীহ করতাম। এরকম একজন মস্তান ছিল কাঁকুড়গাছির ভুটান। একটা ছুরি মারার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে বেশ কিছুদিন থাকার পর জামিনে ছাড়া পেয়েছিল। পরিচয় না জেনে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ভুটানের দলের দুজনকে বেধড়ক মারধোর করেছিল। তারই ফলে ভুটান একটা স্কুটারে করে আমাদের আড্ডায় এসে শাসিয়ে গেছিল। কাজে-কাজেই ভুটান-ভীতি থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে সত্য-র পরামর্শে 'টপ হিরো পার্টি'র স্থানীয় নেতা খোকনদার বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

খোকনদা ছিলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলের চাকুরে, সি. পি. আই. এম.-